***International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)***
*A Peer-Reviewed Monthly Research Journal*
*ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)*
*Volume-I, Issue-IV, May 2015, Page No. 1-5*
*Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.irjims.com*

# গঙ্গা-হুগলী মধ্যবর্তী ভাগীরথী এবং পদ্মার দোয়াব অঞ্চলের আদিবাসীদের উৎস এবং ভাষা

**স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী**

***Abstract***

*The Tribals society of the East Bhagirathi area and their Origin and Language. Opinion about Tribals Anthropologist. The use of the word 'Tribal' or 'Tribes'. Their classification regarding Anthropological Division. Analysis of the characteristics of Tribal Society. Their mode of pronunciation and specialties. Sociological and Anthropological side. The effect of industrial revoilution and civilization of the English on the Tribal society with the remet of the use of a weapon of destruction. The simple life style of the Triblas. The Tribal Society – the victim of Exploitation and Fraudulence.*

*The Origin of the Tribal Society and its sub-Tribal section. Their colonialism. Their deseription of appearance. The 'BENGA' Land of the MUNDAS- A sacred place. Reservation of their language various stage of the Tribal Society.*

*Keywords: Anthropologist; Panchaeti; Homogeneity; Takkar Bappa; Gandhijee; Tribe; Natural Balance; Protoastroloyed clan; Cultural corlnialism; The Modren Indian Aryan Language; The character of Tribal Society; The English Rule; Anthropological division.*

আদিবাসী সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত লক্ষ্য করার মত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীদের মতামত লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, আদিবাসীরা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনে জটিলতা নেই, যারা এখনো একই ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সাদৃশ্য আছে। নিজেদের নিয়মকানুন রক্ষার জন্য যাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠীসচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বা সংগ্রাম করে থাকেন। অন্য একজন বলেছেন যে আদিবাসীরা এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বাস করে এবং যাদের সংস্কৃতিক জীবনের সামঞ্জস্য (Homogeneity) বর্তমান। জনৈক ভারতীয় গবেষক বলেছেন যে, আদিবাসী সমাজ হলো কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার যাদের নামের সমতা থাকে, সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই রূপ বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা নিষেধ মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা, সামঞ্জস্য ও আদান-প্রদান করে থাকে।

আদিবাসী প্রসঙ্গে বলতে গেলে একটা কথা প্রথমেই উল্লেখ প্রয়োজন যে, আদিবাসীরা এদেশে প্রাচীন হলেও তাদের সম্পর্কে অধুনা প্রযুক্ত 'আদিবাসী' শব্দটি কিন্তু নিতান্তই অর্বাচীন। যতদূর জানা যায় ঠক্কর বাপ্পা এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে গান্ধিজী এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এই নাম ব্যবহার করেন। ইংরেজী 'Tribe' (ট্রাইব) শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় বর্তমানে 'আদিবাসী' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। তবে আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে এই সূত্রগুলি সত্য হলেও অধুনা আদিবাসী সমাজের দ্রুত বিবর্তন ঘটছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে দ্রুত সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন, ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিনষ্ট এবং আদিবাসীদের সারল্যের সুযোগ তথাকথিত সভ্য মনুষ্যের প্রভুত্ব, লালসা এদের গোষ্ঠী জীবনে যুগযুগান্তের ধারাবহে ব্যতিক্রমের সূত্রপাত করেছে। সেই সাথে একালে সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের নামে ভারতীয় আর্যভাষায় এদের শিক্ষিত করে আমেরিকান রেড-ইণ্ডিয়ানদের মত এদের সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতায় বাধ্য করা হচ্ছে।

নৃতাত্ত্বিকগণের বিচারে বাংলার বাসিন্দারা আর্য নন। তারা প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েড গোষ্ঠী সম্ভূত বলে নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা। সাম্প্রতিক কালের বাঙালি নব্য-নৃতাত্ত্বিকগণ অবশ্য এই মতকে খন্ডন করে দাবি করেছেন, মাত্র আদিবাসী বলে পরিচিত উপজাতি গোষ্ঠী এবং নিম্নবর্ণের কয়েক গোষ্ঠী ব্যতীত আর অন্যান্য সমস্ত বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর নন। তবে এ সম্পর্কে কোন মতবাদের পোষক নৃতাত্ত্বিকগণই অস্বীকার করেন না যে, বর্তমানের বাঙালি জাতির গরিষ্ঠ অংশই মিশ্র জাতির। এ বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নৃতাত্ত্বিক বিচারেও বহিরাগত জনগোষ্ঠীর মতই সংমিশ্রণ ঘটে থাকুক না কেন, বাঙালি জাতি বাংলার মাটির সঙ্গে আবহমান সংযুক্ত। তার উত্তরাধিকারের শিকড় প্রাক-আর্যযুগ তো বটেই; এমনকি প্রাক-দ্রাবিড় যুগকে অতিক্রম করে, প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ, পুরাতন প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু অবাক হবার মত যে, বাঙালির ভাষা আরযভাষা সংস্কৃত সম্ভূত। অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা উত্তর ভারতীয় কিংবা উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় ভাষার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার কাছে ঋণ স্বীকারে অকৃপণ। বাংলা ভাষার দেশী-বিদেশী

শব্দভাণ্ডারের চেয়ে তৎসম শব্দের ভাণ্ডার, অন্য যে কোন ভারতীয় ভাষার তুলনায় অবিকৃতভাবে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালিজনগোষ্ঠী আর্যদের থেকে যত বেশি দূরত্ব বজায় রেখেছে ভাষার ব্যবহারে বিপরীতক্রমে ততবেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

আদিবাসী সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদিবাসী সমাজের মূল ধারাটির পতাকা যাঁরা বহন করছে তারা মুণ্ডা বলে পরিচিত। এই মুণ্ডা সমাজেরই নানা স্তরভেদ এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া গোষ্ঠী ছোটনাগপুরের বনাঞ্চল থেকে গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল পর্যন্ত সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর এই বিভাগ সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব গবেষকের বিষয়। এখানে তার আলোচনার অবকাশ নেহাতই নগণ্য। আমরা সাধারণভাবে শুধু এই বিভাগকে মেনে নিয়ে, আদিবাসী সমাজের এই গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করবো। সমগ্র আদিবাসী সমাজ দূরের কথা, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেরও সামগ্রিক বিশ্লেষণ নয়। এমনকি পশ্চিমবাংলায় আদিবাসী অধ্যুষিত যে জেলাগুলি সেগুলিও আলোচ্য প্রবন্ধের বহির্ভূত। যে জেলাগুলিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আদি মূল সম্পর্ক নেই, আদৌ তারই এলাকার আদিবাসীদের ভাষিক প্রবণতা এই প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ। আরও প্রাঞ্জল করে বলতে গেলে গঙ্গা-পদ্মার দোয়াব অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্পর্কেও বিস্তারিত কোন বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। এই এলাকার আদিবাসীদের ভাগে এবং উচ্চারণরীতির উপর স্থানীয় ভাষার প্রভাব নিরূপণেই এর সীমাবদ্ধতা। ফলে আদিবাসী সমাজ, তাদের অতীত ইতিহাস, শিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এমনকি ভাষা প্রসঙ্গেও যতটুকু আলোচনা সেও নেহাতই মুখবন্ধ মাত্র। তত্ত্ব ও তথ্যের চেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সাধারণ সাদামাটা আলোচনায়। এমনকি সামগ্রিক আধুনিকতম পরিসংখ্যানকেও নির্ভর করা হয়নি। সরকারী বা অন্য কোন গবেষণামূলক নিবন্ধের চেয়েও নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকার আদিবাসী সমাজের আমার নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের উপরই নির্ভর করেছি পুরোপুরি। সুতরাং এই তথ্য সম্পর্কিত বিষয়ে যদি কোন সাধারণ গরমিল নজরে আসে তাকে উপেক্ষা করাই হবে শ্রেয়। আদিবাসী জনজীবন এবং সমাজব্যবস্থা তাদের উপজাত বিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা সাধারণভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির উপরই নির্ভরশীল।

এদেশে ইংরেজ শাসনের আগেও আদিবাসী সমাজে তাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বর্তমান ছিল। এমনকি তাদের বিশাল রাজত্ব ছিল বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। চতুর্দশ শতাব্দে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তুঘলকের সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলির বিরুদ্ধে তারা বীরবিক্রমে লড়াই করেছে চাম্পা দুর্গ রক্ষা করতে। হয়তো একথা বলা অতিরঞ্জিত নয় যে, সেদিন পর্যন্ত তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সামগ্রিক ভারতীয় সমাজের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এই সম্পর্ককে ছিন্ন করেছে। ইংরেজদের শিল্পোন্নত সভ্যতার মারণাস্ত্রের সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, এই আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের সংকুচিত করে নিয়েছে অরণ্যের বিবরে। সর্বোপরি ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ নিজেদের অর্বাচীন ধর্মবিশ্বাস, উন্নাসিক ইউরোপীয় যাজক সম্প্রদায়ও ইতিহাসে সামান্য ধারণার সূত্রে আদিবাসী সমাজের ধর্মবিশ্বাসের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে উপলব্ধি করতে না পেরে, এবং তাদের জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর সারল্যের মর্ম উপলব্ধিতে অসমর্থ হয়ে, এদের সভ্য করার নামে যে ধর্মীয় অভিযান শুরু করে, তাতেই আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি আরও বেশি করে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়, নিজেদের মূল সংস্কৃতি এবং ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা আধুনিক সভ্যতার কল্যাণ সন্দেহ করতে শুরু করে, নিজেদের সংস্কৃতিকে হীনমন্যতায় সংকুচিত করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সেই সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত নতুন ভারতীয় সমাজও তাদের অবহেলা করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারিতীয় সমাজ এদের উপর শোষণের ষ্টীমরোলার চালাতে কার্পণ্য করেনি। ফলে দেশের অন্যান্য শ্রমজীবীর মতই এরাও হয়ে পড়েছে দরিদ্র। বরঞ্চ বলা সঙ্গত যে, এদের সেই সঙ্গে জুটেছে উন্নাসিক অবহেলাও। অভিশাপ এতই নির্মম হয়ে নেমে এসেছে যে, সমগ্র আদিবাসী সমাজই এই দারিদ্র্যের এবং সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন অশিক্ষার শিকার হয়ে পড়েছে। ভূমিপুত্র পরিণত হয়েছে ভূমিদাসে। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক দাসত্বেও। একদিকে অরণ্যের করুণার কাছে বনজ সম্পদের উঞ্ছবৃত্তি, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুরি, এবং নিরক্ষরতা আর আধুনিক সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক টানাপোড়েন - এই হয়ে দাঁড়িয়েছে আদিবাসী সমাজের জীবনযাত্রার উপায়। ফলে ইতিহাসের গৌরব আধুনিক সভ্যতার জনক, নগর সভ্যতার স্রস্টা এই ভারতীয় জনসমাজের জীবন থেকে নাগরিকতাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দারিদ্র এবং অজ্ঞতা হয়ে পড়েছে নিত্যসঙ্গী। আধুনিক শিক্ষা থেকে হয়েছে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এমনকি নিজেদের গোষ্ঠী জীবনেও এসেছে নির্মম আঘাত। নানান স্বার্থ তাদের শক্তসামর্থ্য নীরোগ শরীরের কর্মক্ষমতায় লোলুপ হয়ে, এদেশের এখানে সেখানে টেনে নিয়ে গেছে। এমনভাবেই সারাদেশের এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট আদিবাসী পল্লী। এদের মাতৃভাষা তার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। নানাগোষ্ঠীতে যেমন বিভক্ত হয়েছে এরা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা এবং সামাজিক আচরণেও পার্থক্য প্রকটিত হয়ে নতুন গোষ্ঠীর নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক বিভাগ অনুসারে ভারতের আদিবাসীদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করলেও ভাষাগত গোষ্ঠীবিভাগ কিন্তু চারটি। বর্তমানে এদেশের আদিবাসী সমাজকে মূলতঃ ভাষাগত উপজাতি হিসেবেই পরিচিত করণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষাগত বিভাগে যে চারটি শ্রেণিতে আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে বিভক্ত করা হয় সেগুলি হল অস্ট্রোএশিয় শ্রেণি, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, তিব্বতী-চীনা ভাষাগোষ্ঠী এবং ইন্দোআর্য ভাষাগোষ্ঠী। অস্ট্রোএশিয় এবং দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর আদিবাসীগণই ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অস্টো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ হিমালয়ের উত্তর পূর্বাঞ্চল, মধ্যভারত, পশ্চিমভারত এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে আছে। এই অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ সুস্পষ্ট। প্রোটো-অস্ট্রেলিয় জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলত তাকে বলা হয়েছে অস্ট্রিক। উল্লেখ্য অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষা বিজ্ঞানীদের কারো কারো মত যে, এই অস্ট্রিক ভাষাই বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। কারণ বাংলা ভাষার গঠন এবং শব্দভাণ্ডার অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার তুলনায় অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর শব্দে সমৃদ্ধ। ভারতে এই ভাষার প্রধান হিসেবে মুণ্ডারী ভাষাকে ধরা হয় যা সাধারণতঃ

সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, কোরওয়া, জুয়াং, কোবরা প্রভৃতি জাতি ব্যবহার করে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় - (১) মোনখামের শাখা এবং (২) মুণ্ডা শাখা। মোনমানের শাখাটির কথায় কথা বলে প্রধানতঃ খাসি এবং নিকোবরীরা। মুণ্ডা শাখাই ভারতের আদিবাসীগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী। প্রধান আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাই এই শাখা থেকে উদ্ভুত। মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর চারটি শাখা - এদের মধ্যে উত্তর মুণ্ডা, মধ্য মুণ্ডা এবং দক্ষিণ মুণ্ডাগোষ্ঠীই প্রধান। উত্তর মুণ্ডা ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই দুই ভাগের মধ্যে খেরওয়ারী গোষ্ঠী থেকেই সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, বিরহড়, কোরওয়া এবং আসুরী - এই আদিবাসী ভাষাগুলি উৎপন্ন। মধ্য মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর বিভাগ মাত্র দুটি। খারিয়া এবং জুয়াং - এই দুই নামে পরিচিত আদিবাসীরা এই দুই ভাষা শাখায় কথা বলে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণ মুণ্ডা ভাষায় কথা বলে গুতোর (গোদার), রোমো (রোস্তা), সোরা (শবর) এবং গোরুম (পারুঞ্জি) শ্রেণির আদিবাসীরা।

ভারতের আদিবাসী সমাজের বিশ্লেষণে, আমরা উত্তর ভারতে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাই, তাদের মধ্যে আটত্রিশটি উপজাতির বাস পশ্চিমবঙ্গের। এদের ভাষা ভাগ হিসাবে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। (১) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী, (২) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, (৩) তিব্বতী-চীনা ভাষাগোষ্ঠী এবং (৪) ইন্দোআর্য ভাষাগোষ্ঠী। এ সকল ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তিব্বতী-চীনা ভাষাগোষ্ঠীর উপজাতির সঙ্গে সমতলের সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। অন্য তিনটি ভাষাগোষ্ঠী মধ্যে পশ্চিমবাংলার যারা সর্বাধিক সংখ্যক বাস করে তারা সাঁওতাল। এবং এর পরই ওঁড়াও এবং মুণ্ডা উপজাতি। এবং রাজ্যের কলকাতা ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা সহ সতেরটি জেলার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক আদিবাসীর বাস মেদিনীপুর জেলায়। মোট জনসংখ্যার বিচারে রাজ্যের আদিবাসীদের ১৭.৫৫ শতাংশেরই এই সব জেলায় বাস। এই জেলার পরেই স্থান জলপাইগুড়ি জেলার। সার রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরই বাস এই দুটি জেলায়। অন্যদিকে যে সব জেলায় নগণ্য সংখ্যক (এক শতাংশের কম) আদিবাসীর বাস সেগুলি যথাক্রমে কলকাতা, হাওড়া এবং কোচবিহার। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় এই হার যথাক্রমে ১.০২, ১.৮২, এবং ১.৪৭ শতাংশ মাত্র। নদীয়া জেলার মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিসেব করলে এই অনুপাত ০.০২ শতাংশেরও কম। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এ জেলার আদিবাসী সংখ্যা মাত্র ষাট হাজারের কিছু কমবেশি। জেলার চোদ্দটি থানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোট ছোট গ্রামে এদের বাস। অন্যদিকে এই প্রায় ষাট হাজার আদিবাসীদের মধ্যেও অন্তত হাজার কয়েক পরিযায়ী। এঁরা বিভিন্ন ইঁটভাটা বা অন্যান্য শ্রমনির্ভর কর্মে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজের মরশুমে আসে এবং কাজের মরশুম শেষ হলে ফিরে যায়।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ দক্ষিণ ভারত এবং মধ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। ইরুলা, টোডা, ওঁরাও, গোল্ড, খোন্দ প্রভৃতি উপজাতিরা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। তিব্বতী-চীনা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ হিমালয়ের পাদদেশে অঞ্চলে বাস করে এবং একমাত্র দুটি ভাষায় - তিব্বতি-বার্মা এবং সাইয়ামিতা চীনা ভাষায় কথা বলে। ইন্দোআর্য ভাষাগোষ্ঠীর বাসিন্দারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। এদের চেহারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের আদিবাসী বলে গণ্য করা হলেও ভাষার উৎস প্রোটো-অস্ট্রেলিয়া বা দ্রাবিড়ীয় নয়। এরা কথা বলে ইন্দোআর্য ভাষায়। যে কোন কারণেই হোক আদি মাতৃভাষা হারিয়ে সাদরি ভাষায় কথা বলে। গিয়ারসন সাহেবের মতে সাদরি ভাষা ভোজপুরী ভাষারই একটা শাখা। চিক, বেদিয়া, লোহারা, খারোয়ার প্রভৃতি আদিবাসীরা ইন্দোআর্য ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত এই সাদরি ভাষায় কথা বলেন।

আদিবাসী নানা গোষ্ঠী তাদের বর্তমান বসতি অঞ্চল এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, প্রাসঙ্গিকভাবে এদের জাতিগত উৎস এবং উপজাতি বিভাগের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ আবশ্যিক বিবেচনা করা যেতে পারে। ভারতের আদিবাসীদের দৈহিক গঠন, মুখাকৃতি ইত্যাদির নিরীখে নৃতাত্ত্বিকগণ এদের সাধারণতঃ প্রোটো অস্ট্রেলিয়, নিগ্রোবটু এবং মঙ্গোলীয় - তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। এদের মধ্যে প্রোটোঅস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর লোকেরা মধ্যমাকার, গাঢ় শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণকায়, এদের নাক চওড়া এবং চ্যাপ্টা, নাকের গোড়া বসা এবং মাথার চুল ঢেউ খেলানো। ভারতে সমগ্র মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এদের বাস। মধ্য ও পূর্ব ভারতের ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, বিরহড়, কোল, ভীল, লোধা, শবর এবং দক্ষিণ ভারতের চেন্টু, কুরুম্বা, বাদামা প্রমুখেরা এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে। নিগ্রোবটু বা নিগ্রোটোবা ভারতের প্রধান এবং প্রাচীনতম আদিবাসী বলে মনে করা হয়। আফ্রিকায় নিগ্রোজাতির সঙ্গে এদের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য রয়েছে। এরা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ঘনকালো চুল এবং কোঁকড়ানো। ঠোঁট পুরু। এদের গোল, লম্বা ও চওড়া মাথা দেখা যায়। দক্ষিণভারতের কাদার, ইরুলার এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ওঙ্গি, আন্দামানী, জারোয়া প্রভৃতি উপজাতীয়রা এই গোষ্ঠীর। মঙ্গোলীয় শ্রেণির লোকেরা উচ্চতায় মাঝারি আকৃতির, গায়ের রঙ হলুদ, মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা, গণ্ডদেশ সমুচ্চ, মাথার চুল সোজা। দেহে ও মুখে লোম ও দাঁড়ি, গোঁফের অভাব, চোখ ছোট। চোখে মঙ্গোলীয় ভাব সুস্পষ্ট। লেপচা, টাটো, রাভা, চাকমা, মগ প্রভৃতিরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। হিমালয়ের পাদদেশ সমূহে এই শ্রেণির লোকেরা বাস করে।

পুরাণ অনুসারে নৃপতিশ্রেষ্ঠ অসুর রাজা বলির পঞ্চপুত্রের অন্যতম বঙ্গে রাজ্য হিসেবেই বা মুণ্ডারী সম্প্রদায়ের পবিত্রভূমি 'বেঙ্গা' দেশ, যে নামেই বাংলা নামের আদি উৎস হোক না কেন বাংলা এবং বাঙালির অস্তিত্বের প্রাচীনত্ব, যে প্রাক-আর্য যুগের সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নামোৎপত্তির শব্দের উৎস বিচার এবং বিশ্লেষণের ব্যাপারটি ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হলেও, সবিনয়ে জানাতে চাই যে, তা ভাষাতত্ত্বের অন্য বিভাগের আলোচ্য বিষয়।

আর্যরা তাদের বসতি এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হলেও নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির নদনদী জলাশয় আকীর্ণ নিয়মিত বন্যা প্লাবিত, মৌসুমী আবওহাওয়া লালিত বাংলাদেশ আর্যদের কাছে একদিকে যেমন দুর্গম ছিল, তেমনি গাঙ্গেয় বদ্বীপ এবং ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীরা আর্য উপনিবেশিকতাকে সহজভবে মেনে নিতে পারেনি; এ

ঐতিহাসিক সত্য। উত্তর ভারতের অন্যান্য সকল অঞ্চলের চেয়ে স্বাভাবিক কারণেই আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এতদ্‌অঞ্চলের আদিবাসী জনসমাজের প্রতিরোধ ছিল তীব্র। বাংলার প্রকৃতিতে লালিত, তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল এই প্রতিরোধে সাফল্যের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তবে এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত যে, বাংলা বলে পরিচিত এই অঞ্চল আর্য উপনিবেশিকতাকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারলেও আর্য সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রভাব এড়াতে পারেনি। সে দ্রুত আত্মস্থ করেছিল। বাংলাভাষার উপর আর্য ভাষার এই অপ্রতিহত প্রভাব দেখে অনুমান করা সঙ্গত যে, বাংলা দেশের আদিবাসীদের বশ মানাতে বার বার আর্যদের অভিযান পরিচালিত হয়েছে এই অঞ্চলে। সামরিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোপরি নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণের আধুনিক মতানুসারে বাঙালির বহির্জগতের সঙ্গে স্বভাবজাত সম্পর্কে প্রবৃত্তি ছিল প্রবল। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক মৌলিকত্বের বিনষ্টি ঘটেছে। বর্তমানে বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে একাধিক নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে।

এই বৈষম্য বিশ্লেষণ করলে, স্বতঃই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে ভারতীয় উপমহাদেশের গঙ্গা-বিধৌত সমভূমির নদী-নালা আকীর্ণ, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপীয় বনাঞ্চলে ঘেরা, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল নিম্নগাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, বাংলা আর্যদের বিজয়রথের চিহ্ন অঙ্কনের পক্ষে খুব সহজ স্থান ছিল না। বাংলা ছিল সত্য অর্থেই পাণ্ডববর্জিত দেশ। সমগ্র উত্তরভারতে আর্যশাসন বিস্তারের শেষ পাদে, বাংলা আর্যগণ কর্তৃক বিজিত হতে শুরু করলে বাঙালি আর্যশাসন যত না সহজে, মেনে নিয়েছে; তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুততায় আত্মস্থ করেছে আর্যভাষাকে। বাংলা ভাষায় এজন্যই এত বিশাল তৎসম এবং সংস্কৃতজাত শব্দ ভাণ্ডার। তবে এ সত্য হলেও, অন্যটুকু এই যে, বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে তার (যেন) আর্য আদিবাসী সত্ত্বাও ছিল ক্রিয়াশীল। এ জন্যই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাতেই আদিবাসী (দেশজ) ভাষার শব্দ সম্ভারের তালিকাও খাটো নয়। এমনকি বাংলা নামেও (অন) আর্য প্রভাব অস্বীকার করা বোধ হয় কৃতঘ্নতার সামিল। বর্তমান বাঙালির আদি পরিচয় 'বঙ্গ' নামে। এই নামের পিছনে যেমন পুরাণোক্ত কাহিনীতেও প্রাক্ আর্য প্রভাবের প্রমাণ মেলে, তেমনি বর্তমানে আদিবাসী বলে পরিচিত; বাঙালির প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর অন্যতম মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মুণ্ডারী ভাষায় 'বেঙ্গা' শব্দটি আজও বর্তমান। যার অর্থ পবিত্র বা দেবস্পর্শী। পশ্চিমবঙ্গের স্থান নাম বিচারে বিশ্লেষণে এখনো এই মুণ্ডারী প্রভাব স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ বাংলা ছিল দেবভূমি বা পবিত্রভূমি।

ভারতের আদিবাসী বসতির মানচিত্রে দেখা যায় যে, উত্তরভারতের একমাত্র হিমাচল প্রদেশ ব্যতিরেকে জম্মু, কাশ্মীর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড় এবং দিল্লীতেও কোন আদিবাসী নেই। আদিবাসীদের বসতি নেই দক্ষিণ ভারতের পণ্ডীচেরীতে এবং লক্ষদ্বীপের সকল স্থানীয় বাসিন্দাকেই ভারতের সংবিধানের তফশিলে আদিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ লখদ্বীপ সম্পূর্ণভাবেই আদিবাসী অধ্যুষিত। অন্যান্য রাজ্যগুলিকে সংবিধানে সংযোজিত তফশিল অনুযায়ী আমরা দেখি অন্ধ্রপ্রদেশে তেত্রিশটি উপজাতির বাস। অসমের স্বশাসিত জেলাগুলির সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীকেই তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিহারে উপজাতির সংখ্যা তিরিশটি, গুজরাতে ঊনত্রিশটি। হিমাচল প্রদেশে আটটি এবং সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতীয় গোষ্ঠীর বাস ওড়িষ্যায়, প্রায় বাষট্টি। এরপর কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ, এছাড়া মণিপুর, মেঘালয়, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরায়। আন্দামানের সকল আদিবাসিন্দাই আদিবাসী। এছাড়া অরুণাচল প্রদেশ, গোয়া দমন দিউ, দাদরা নগর হাভেলি ও মিজোরামে আদিবাসীরা বর্তমান। উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, সিকিম, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে এদের দেখা মেলে।

গাঙ্গেয় নিম্ন সমভূমি অঞ্চলের এই এলাকার এবং পূর্বভারতে আর্য অভিযানে, তৎকালীন আদিবাসী সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগোষ্ঠী এই ধারণাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেও, তাদেরই এক বিশাল গোষ্ঠী কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করতে নারাজ হয়েছে। তারা লড়াই করে উন্নত যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত আর্য ঔপনিবেশকদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে হার মেনে আশ্রয় নিয়েছে ছোটনাগপুরের রুক্ষ্ম পর্বতসঙ্কুল বনাঞ্চলে। কালক্রমে এই বিস্তৃর্ণ বনজঙ্গল এবং রুক্ষ্ম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে। তাদের আচার আচরণ ধর্ম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশে পুষ্ট ক্রমোন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে। জঙ্গল তাদের জীবন সংগ্রামেই সবটুকু শুষে নিয়েছে। হারিয়ে গেছে তাদের জ্ঞানচর্চার অঙ্গীকার। এরই ফলে ক্রমবিকশিত মানব সভ্যতার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ থেকে বঞ্চিত এই সমাজ অনুন্নত হয়ে পড়েছে, কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এরা পরিণত হয়েছে, ভারতের কায়িক শ্রমজীবী অন্ত্যজ গোষ্ঠী হিসেবেও।

আদিবাসী সমাজের এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের ভাষাকে সংরক্ষণ করেছে যুগ যুগ ধরে। তথাকথিত কৃষ্টিবান শাসক সমাজ এবং তাদের কাছে আত্মসমর্পণকারী এই সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিবর্তিত ভাষা, এই সমাজের মধ্যে খুব কমই বিস্তার করেছে। কিন্তু যুগ পরিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে, জীবনযাত্রাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই স্বেচ্ছা নির্বাসিত সমাজের, একরকম বাধ্য হয়েই ধীরে ধীরে যোগ ঘটেছে সমাজে। কিন্তু তারা সংস্কার বশেই নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে বর্জন করেনি। ফলে তারা হয়ে উঠেছে দ্বিভাষিক। ভাষিক প্রবণতায় অবশ্য স্থানীয় ভাষার দিকেই ঝোঁক বেশি। স্থানীয় ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। ভাষিক বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় যে এদের মধ্যে সাঁওতালী বা গোষ্ঠীগত উপভাষা এ সব জেলায় ক্ষীণ হয়ে আসছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী আদিবাসীদের মধ্যে গরিষ্ঠ হলেও এবং এদের ও মালপাহাড়িয়াদের নিজস্ব লিপিমালা থাকলেও তাদের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই। এদের শিশুদেরও যতটুকু হয় শিক্ষার মাধ্যম বাংলাই। ফলে শিক্ষাবিস্তার প্রসারিত হওয়ার জন্য ভাষিক প্রবণতা আনুপাতিক পরিশীলত স্থানীয় ভাষার দিকে ঝুঁকছে। সে কারণে এদের কথোপকথনেও উপজাতীয় গোষ্ঠীগত শব্দ ব্যবহার কমে আসছে। এরই সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যে একটি বিশিষ্ট বাক্‌রীতি সমতলের অনুপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সংস্কার হয়ে আছে; তার পরিবর্তন ঘটছে।

গঙ্গা-পদ্মার দোয়াব অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য শিল্পবিস্তারের কারণে দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় যেমন খুব অল্পই সন্ধান মেলে তেমনি এদের একটা গরিষ্ঠ অংশই জীবিকার প্রয়োজনে শিল্পাঞ্চলে বাস করে। এছাড়া বিচ্ছিন্ন যে পকেটগুলি রয়েছে সেগুলি অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার শিল্পাঞ্চল বহির্ভূত অঞ্চল এবং নদীয়া মুর্শিদাবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। এদের ভাষিক বৈষিষ্ট্য ঐ জেলাগুলির বিস্তৃত পরিসংখ্যান ছাড়াই সীমিত কয়েকটি পকেট এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মিশ্র পরিবেশে কর্মরত আদিবাসী পরিবারগুলিকে অবলম্বন করে তাদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক রীতিনীতি এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

**তথ্যসূত্র / গ্রন্থঋণ :**


১) Bag Dhanapati, Santal Samaj Sameeksha-Astudyon Santal Society, Samatat Prakashani, Cal, 1983
২) Chowdhuri A.B., State Information among tribals : A quest for Santal Society , NewDelhi, 1993
৩) Materials for A Santal Grammar I, P.O. Bodding 2011
৪) Rome, A Grammar of Organ Language, Cal, 1924
৫) Norman H., The Munda Language, 2008
৬) Peterson J., A Grammar of Kharia, 2010
৭) A. Mibea, Census of W.B. Tribes & Castes of W.B., 1951
৮) J.B. Pride, The Social meaning of Language, 1971
৯) Language & Social Behaviours, W.P. Robinson, 1972
১০) সিংহ মানিকলাল, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, কলকাতা
১১) দাস ক্ষুদিরাম, সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠতা, কলকাতা
১২) দাস নির্মল, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯৮৪
১৩) বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাস, সাঁতালি ভাষা, বাং ১৩৪৫
১৪) ভৌমিক প্রবোধ কুমার, উপজাতির ভাষা, কলকাতা
১৫) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, সুবর্ণরেখা কলকাতা ১৯৮৭
১৬) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালাপার্বণ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ২০০৫
১৭) ভৌমিক সুহৃদয় কুমার, বাঙালির জাততত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়, ঐ


*****